13 MAY 2003

যুগান্তর

সাড়ে ১৩ শত স্কুল ফেল

গত বৎসর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় সাড়ে ১৩ শত বিদ্যালয় হইতে ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। আর চারশত স্কুলে পাসের হার ১০ শতাংশেরও কম। রবিবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষামন্ত্রী এই উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। দেশে বর্তমানে ১৩ হাজারের মতো মাধ্যমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী ১০ শতাংশের বেশি বিদ্যালয় ফেলের তালিকায়। তবে কেন এত বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে একজন পরীক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হইতে পারিল না এবং ইহার দায়দায়িত্ব কাহাদের সেই বিষয়ে সংসদ সদস্যগণ আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এমন খবর কোন সংবাদপত্রে দেখা গেল না। সরকারের দিক হইতে এই গুরুতর বিষয়টি নিজ উদ্যোগে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয় নাই। এমন উদ্বেগজনক তথ্য পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রায় এক বৎসর পর কেন দেশবাসী জানিতে পারিল, সেই প্রশ্নও কেহ করেন নাই। শিক্ষামন্ত্রী কেবল একজন সংসদ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে জানাইয়াছেন, যেই সকল বিদ্যালয় হইতে কোন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই তাহাদের এমপিওভুক্তি কেন বাতিল করা হইবে না উহার কারণ দর্শাও নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। দেশে একাধিক শিক্ষক সংগঠন সক্রিয়। শিক্ষকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য তাহাদের তৎপরতা লক্ষণীয়। এই অবস্থায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রমে এমন দৈন্যদশার পরও তাহারা উহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছেন কিনা সেই প্রশ্ন স্বাভাবিক। শিক্ষার এত বড় সমস্যা লইয়া ছাত্র সংগঠনগুলিরও কি কিছুই করিবার ছিল না? গত বৎসর ৭টি শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৪০ শতাংশ। এই হারকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল হইতে ফল বিপর্যয় হিসাবে অভিহিত করা হয়। আর সরকারের তরফ হইতে বলা হয় নকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কারণেই পাসের হার কমিয়া গিয়াছে। বর্তমানে বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের ৯০ শতাংশ বহন করে সরকার এবং এই বাবদ প্রতি বৎসর ব্যয় হয় ১৭ শত কোটি টাকা। বাকি ১০ শতাংশ বহনের জন্যও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবকাঠামো নির্মাণেও সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দিয়া থাকে। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য যথোপযুক্তরূপে গড়িয়া তুলিবার বিষয়টি প্রধানত শিক্ষকদের উপরে বর্তায়। যেই সাড়ে ১৩ শত বিদ্যালয় হইতে একজনও পাস করে নাই সেইগুলিতে টেস্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কি সম্পন্ন হইয়াছিল? বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের দায়িত্ব যেই সকল সরকারি কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত তাহারা কি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন? বিদ্যালয়ে পর্যাপ্তসংখ্যক মানসম্পন্ন শিক্ষক না থাকিবার পরও কি তদবির কিংবা দুর্নীতির মাধ্যমে এমপিওভুক্তির অনুমোদন মিলিয়াছে? সরকারকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে হইবে। এসএসসির সিলেবাসে পরিবর্তন আনা হইয়াছে। প্রশ্নপত্রের ধরনও পাল্টানো হইতেছে। এই পরিবর্তন গড়পড়তা ছাত্রছাত্রীদের মানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেই প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সবচাইতে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হইয়া থাকে। দক্ষ মানবসম্পদ গড়িয়া তুলিতে এই বরাদ্দ আরও বৃদ্ধির দাবিও যৌক্তিক। কিন্তু অর্থ বরাদ্দ করা মানেই যে শিক্ষার মান বৃদ্ধি নয় ফেল করা স্কুলের দীর্ঘ তালিকা সেই সত্য চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল। ইহাতে সংশ্লিষ্ট সকলের টনক নড়ে কিনা উহাই দেখিবার বিষয়।